শরৎকামিনী চৌধুরাণী ও সেনবাড়ীর দুর্গাপূজা

লেখকঃ অরূপ চৌধুরী
যোগাযোগঃ aroop.cisticola@gmail.com
পরিচিতিঃ পেশায় শিক্ষক, নেশায় লেখক, চিত্রকর এবং সর্বোপরি পক্ষিতত্ত্ববিদ, শ্রী চৌধুরীর অন্য উৎসাহ হলো চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা বিস্তৃত তাঁর পরিবারের স্বনামধন্য পূর্বসুরীদের উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের সন্ধান ও তা লিপিবদ্ধ করা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। শরৎকামিনী সেন চৌধুরাণী, ময়মনসিংহ সেনবাড়ীর সম্ভবত একমাত্র মহিলা জমিদার, সম্পর্কে তাঁর প্রমাতামহী, তাঁকে নিয়েই এবারের স্মৃতিচারণ।

শ্রী শরৎকামিনী চৌধুরাণী দেবী। এমন একখানা জবরদস্ত নাম শুনলাম যখন দশমশ্রেণীতে পড়ি। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ফলাফল বের হতে যে তিন মাস খানেক সময় লাগে, সেই সময় আমিও একটা কাজ জুটিয়ে ফেললাম। পুরনো কিছু খাতা ছিল বাড়ীতে, যেগুলো দেখতাম মা যত্ন করে আগলে রাখেন। সেই খাতায় কি আছে তা দেখবার নেশা চেপে বসল। আর তাই নিয়ে বসে গেলাম। নীলচে খাতার প্রথম পাতায় নীল কালিতে ভারি সুন্দর হাতের লেখায় দেখলাম লেখা – শ্রী শরৎকামিনী চৌধুরাণী দেবী, ৩০।৩।১৯৩৭, সেনবাড়ী। কি পেলাম সেই খাতায়? অজস্র কবিতা আর বিচিত্র সাহিত্যের এক আশ্চর্য জগৎ।

সুবর্ণরেখা দাশগুপ্তা, আমার দিদিয়া (দিদিমা; ছোটবেলায় বোধহয় 'ম' উচ্চারণ করতে পারতাম না), শিশুকাল থেকে আমার বন্ধু, তাঁকে গিয়েই ধরলাম, বলো দেখি, শরৎকামিনী কে? দুই কথার জবাব পেলাম, 'আমার মা'। দেশভাগের আগে অনেকটা সময় শরৎকামিনী ঢাকায় তাঁর বড়োমেয়ে সুবর্ণরেখার কাছে কাটিয়েছিলেন, যে কারণে অনেক স্মৃতি কথাই জমা হয়েছিল দিদিয়ার কাছে, আর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী দিদিয়া অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন শরৎকামিনী সম্পর্কে। তাছাড়াও শরৎকামিনীর তিন ছেলে, সুকুমার (আমাদের 'বড়দাদু'), সুশান্ত ('ভুলুদাদু') ও সুপ্রতুল ('বুচুদাদু') সেনচৌধুরীর কাছেও জানতে পেরেছিলাম তাঁদের মা'র সম্পর্কে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য ও ঘটনাসমূহ।

'শরৎকামিনী'কে আমি দেখিনি। যাঁকে দেখেছিলাম, তিনি আমার দিদিমার মা, জানতাম 'বড়মা' বলে; আশির প্রান্তে পৌঁছনো এক লোলচর্ম বৃদ্ধা, তবু কি অসাধারণ সুন্দরী, কি অদ্ভুত স্নেহ মাখা দুটি চোখ। প্রতিভাময়ী সেই শরৎকামিনী বোধহয় দেশবিভাগের পর অনেকটাই হারিয়ে গেছিলেন, বেঁচে রইলেন আমাদের বড়মা, মা-মাসির দিদিমা হয়ে, যাঁকে আমি পেয়েছিলাম। বহু দেশ ঘুরে শরৎকামিনী তাঁর শেষ আবাস গড়েছিলেন দক্ষিণ ২৪-পরগনার রাজপুর-এ চৌহাটি গ্রামে। ছায়া ঘেরা সে বাড়ীর কথা আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। চারপাশে বাগান, আম, বাতাবিলেবু, বেল, কাঁঠালের গাছ। পশ্চিমে পুকুর, পাশে বাঁশঝাড়। বড়মা পুকুরধারে ভাত ছড়িয়ে দিতেন, নিঝুম দুপুরে ডাহুক পাখি আসতো সে ভাত খেতে, আর তাঁর বড়ছেলে সুকুমার রঙ তুলি নিয়ে বসে সে পাখির ছবি এঁকে রাখতেন।

ময়মনসিংহের সেনবাড়ী তখন অন্যদেশের সম্পত্তি, জমিদারী আর নেই। বাঁশের কলমে আর লেখা হয়না কবিতা। বড়মা তাঁর নির্জন গ্রামের বাড়ীতে বসে রান্না করেন চিংড়ি দিয়ে কচুর লতি, কাঁঠালের মালপোয়া কিংবা কলাপাতায় মৌরলা। অমাবস্যায়, নিকষ অন্ধকারে বারান্দায় বসে একা একা আবৃত্তি করে চলেন – 'শ্রাবণের অমানিশা গভীর আঁধার, ভীষণ বজ্রের নাদ চমকে বিদ্যুৎ, মেঘের বর্ষণধারা থামিবেনা আর, অগ্রসর হয়ে এলো শমনের দূত।'

প্রিয়দর্শিনী শরৎকামিনী। সব কিছুর মধ্যেই সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন তিনি। জীবন কে সাজাতে জানতেন। দেশভাগ, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, প্রিয় সেনবাড়ী থেকে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা, মনকে বড় আঘাত দিয়েছিল তাঁর; তবু

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। শহরে অথবা গ্রামে, কলকাতায় কিম্বা মধুপুরে, গোয়ালিয়র অথবা গৌহাটি, সর্বত্র দেখি মানুষকে ভালবেসেছেন, আপন করে নিয়েছেন, হয়ে উঠেছেন সকলের প্রিয় ‘দিদিমা’।

শরৎকামিনী ও সেনবাড়ীকে ঘিরে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে সেনবাড়ীর দুর্গাপূজার চমকপ্রদ গল্পও আছে। ‘ভুলুদাদু’ সুশান্ত সেনচৌধুরীর স্মৃতিচারণ থেকে তার কিছু বর্ণনা তুলে দিলাম এখানে। তিনি বলছেন – মা ডাক দিতেন, ‘ভুলু, দ্যাখ্‌ তো এইবার রথযাত্রা কবে আইলো! আর ফইজলা মিঞারে দিয়া ঝুনা দেইখ্যা কিসু নাইরকোল পাড়ান লাগব।’ এই কথা ছিল পূজার আগমন বার্তা ঘোষণা, শুনলেই জামকাঠের সিন্দুক থেকে বার হতো লালশালু মোড়া সিন্দুর-লেপা পঞ্জিকা। রথযাত্রার দিন জানা গেলে শরৎকামিনী বুঝতেন পালমশাই নিবারণ পাল, ছেলে সুধাময়, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো আত্মীয় মিলিয়ে প্রায় বারো চোদ্দ জন মূর্ত্তি গড়ার মানুষ হাজির হবেন; তাদের জন্যে সদর থেকে আসবে ধুতি আর লাল গামছা, আর নিবারণ পালমশাই-য়ের জন্য বড়ো ছাতা। আষাঢ় মাসের রথযাত্রার দিন, কাঠামো পূজা সেরে নতুন খড় বরণ করে তুলে দেওয়া হতো পাল-দের হাতে। এদিকে খোঁজ পড়বে ফইজল মিঞার, সে এসে সমস্ত নারকোল পেড়ে, ছোবড়া ছাড়িয়ে, নারকোল পাঠাবে নিরামিষ ঘরে, আর ছোবড়া যাবে ধুনুচি তেল-সলতের ঘরে। মলিনার মা, নুরজাহান বিবি সেখানে সব গুছিয়ে তুলে রাখবে আশ্বিন মাসের জন্য। ময়মনসিংহে হিন্দু মুসলমান সব প্রজা মিলেমিশে থাকতো – ফইজল মিঞা ছাড়া যেমন পূজার জন্য সেরা ফল জোগাড় করার লোক ছিলনা, তেমনই নুরজাহান বিবি, নুসুর মা, মলিনার মা ছাড়া পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করে গুছিয়ে রাখার লোক কই? শরৎকামিনী বলতেন, ‘হগ্‌গল (ময়মনসিংহের ভাষায় ‘সকল’) লোকই তো মানুষ, কেউ ধুতি পড়ে কেউ লুঙ্গী পড়ে! তফাৎ আর কই!’

রথের সময় প্রবল বর্ষা। আগের দিন শরৎকামিনী, তাঁর বোনেরা আর ভাইবউ-এরা সবাই মিলে সারা দিন রাত খেটে বানাতেন বকুলপিঠা, আলুই পিঠা, তিলের পিঠা, রসমোয়া, কচুর ফুলুরি, নারকোলের গঙ্গাজলি, নাইল্যাপাতায় (পাটপাতা) কাঁঠালবিচির বড়া আর আমের মোরব্বা। শরৎকামিনী পড়তেন পাটভাঙ্গা ধোয়া শাড়ী, রঙ সর্ষেফুলের মতো হলুদ, সবুজ লালের নক্সা করা পাড়, সারা গায়ে রূপোর সুতোয় আসমানী বুটি, দেশের ঢাকাই তাঁতীদের বানানো।

এতো পরিশ্রম করে বানানো মিষ্টি মণ্ডার বড়ভাগ যেত পালেদের জন্য, তারপর বিলি হতো বিভিন্ন কাজের লোকের জন্য (আর সব শেষে পেতো বাড়ীর ছোটরা – তাই বলে কিছু কম পড়তো না, কারণ তখন অভাব বলে কিছু ছিলনা)। শরৎকামিনী সব সময় বলতেন, ‘অরা (ওরা) খাটে, পরিশ্রম করে, অগোদের (ওদের) আগে দাও।’ সেনবাড়ীর বয়স্ক মানুষজন সবারই এই চিন্তাধারা ছিল; শরৎকামিনী শুধু ছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষে। তাঁর বাবা ছিলেন সেকালে ব্যতিক্রমী মানুষ, জমিদারীর সাবেকী ধারার বিপক্ষে – ওই নিপীড়ন, শোষণ, জোর করে সম্মান আর খাজনা আদায়, নায়েব মুন্সীর অত্যাচার, এসব থেকে বহুদূরে থাকতেন; এই উদারস্বভাব জমিদারী প্রথার আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন শরৎকামিনী। যদিও দেখাশোনা করতেন তাঁর ভাই-রা, তাঁকে তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং পরামর্শ চাইতেন, তাই জমিদারী পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা প্রবলভাবে প্রকাশ পেতো।

শ্রাবণ মাসের মনসা পূজার পরপরই আসতো দর্জি আর তাঁতীরা। শরৎকামিনী ছোটদের সবাইকে ডেকে একসারে দাঁড় করাতেন। দর্জি ছোটদের জামা আর বড়দের পাঞ্জাবীর মাপ নিতো। তাঁতীরা লিখে নিতো কার জন্য ক’খানা ধুতি; তিন মেয়ে পেতো নক্সা পাড়ের ডুরে শাড়ী, শরৎকামিনী নিতেন বুটিদার অথবা ময়ুরপংখী শাড়ী। মখমল আর মসলিন নিতেন গায়ের চাদরের জন্য, আদ্দি কিনতেন সেমিজের জন্য। নিজে কাগজে নক্সা এঁকে দিতেন, দর্জি তা দেখে তাঁর জামা বানাতো। পরে যখন বাড়ীতে সেলাই মেশিন এল, শরৎকামিনী নিজে হাতে জামা সেলাই করতেন। দেশ বিদেশের মানুষজন যাঁরাই সেনবাড়ী আসতেন, তিনি তাঁদের জামার নক্সা দেখে এঁকে রাখতেন, তাঁর সংগ্রহে ছিল মণিপুরী, পাঠান, রাজস্থানী, হিমাচলী আর গুজরাটী নক্সার মেয়েদের জামাকাপড় – নক্সাখাতায় নক্সা, মাপ, রঙ, কোন পোষাক কোন অনুষ্ঠানে পরনীয়, তা বিশদ লেখা থাকতো। সবই বার হতো দূর্গাপূজার আগে, ঐ শ্রাবণ ভাদ্রে।

সারাদিন অঝোরে বৃষ্টির মধ্যে ঘরে খাওয়াদাওয়া, আর নাটমন্দিরে বসে পালমশায়ের কাজ দেখা, এ ছিল বড়ো কাজ। সকালে ঘুম থেকে উঠতে ঠাকুর রান্নাঘরে বসিয়ে খেতে দিত গরম গরম ফেনা ভাত, সাথে ছোট আলু, ক্ষেতের নতুন বেগুন আর ঘরে বানানো ঘি। একই সাথে খেতে বসতো নিবারণ মশায়ের দলবল। খেতে খেতে তারা আলোচনা করতো মূর্ত্তির মাটি তৈরী, রঙ বানানো, আরও কত কি নিয়ে। সারাদিন চলতো তাদের কাজ, ছেলেমেয়েরাও যতক্ষণ পারে বসে দেখত। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামলে বাগানে ফুটে উঠতো সন্ধ্যামালতী – গোলাপী, সাদা, হলুদ; পুকুর পাড়ের চাঁপা গাছটা ফুলে ফুলে ভরা থাকতো, তার গন্ধে ম-ম করতো। নিবারণ মশাই রোজই কিছু চাঁপা ফুল নিয়ে অঞ্জলি দিতেন অসমাপ্ত মূর্ত্তির সামনে, হাত জোড় করে বলতেন, ‘মা গো, মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী হও মা, পঞ্চভূতে তোমার অবস্থান, সেই জলমাটি কাদাতেই গড়ি তোমার বিগ্রহ, তুমি বিমূর্ত থেকে মূর্ত হও, নিরাকার থেকে সাকার হও, আমার দৃষ্টিকে সার্থক কর।’ নিবারণ পাল বছরের অন্য সময়ে পালাকীর্তন করতেন এবং যাত্রাদলে কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার চরিত্রে অভিনয় করতেন। যাত্রা চলাকালীন তিনি ধীরু নাপিতকে দিয়ে নিয়মিত দাড়ি গোঁফ কামিয়ে রাখতেন – যখন শাড়ী পড়িয়ে মাথায় ওড়না দিয়ে দেওয়া হতো, তখন কে বলবে তিনি মেয়ে না ছেলে! মঞ্চে ওঠার আগে কষে তামাক খেয়ে নিতেন, রেড়ীর তেলে প্রদীপ জ্বালিয়ে শরৎকামিনী তা পাঠিয়ে দিতেন ময়না দাসীর হাতে। ছোটদের সন্ধ্যেবেলায় খেতে দেওয়া হতো মুড়ি আর সরভরা ঘন দুধ, তারপর রাতের খাওয়া শেষ হতো ভাত আর মুসুরির ডালের সঙ্গে আলুবেগুন কুটিভাজা দিয়ে। ঠাকুরকে দিয়ে শরৎকামিনী রোজকার রান্না করাতেন আর নিজেহাতে পরিবেশন করতেন।

ধীরে ধীরে বর্ষা কমে আসতো। সন্ধ্যে হতে হিম পড়তো। একটু শীত শীত ভাব। শরৎকামিনী ছেলেমেয়েদের বার করে দিতেন তুষের চাদর আর কান ঢাকা বনাতের টুপি। পায়ে দিতাম হাফ মোজা আর বার্ণিশ করা চটি। এরই মধ্যে এক এক করে তিনি সাজাতেন বসবার ঘর, শোবার ঘর, মায়ের পড়ার ঘর; নিজে হাতে বানাতেন আর সুতোয় নকশী করতেন সমস্ত বালিশের ঢাকনা, বিছানার চাদর আর টেবিল কভার। প্রতি বছর পূজার আগে সমস্ত কিছু তিনি নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতেন। তাঁর ভীষণ অপছন্দ ছিল অতিরিক্ত গাঢ় রঙ; তাই তাঁর নির্দেশে বাড়ি ঘর বিছানা বালিশ চাদর সবই সাদা রঙের হতো।

ভাদ্রের শেষে, আশ্বিনে পালমশাই দেবীর গায়ে প্রথম রঙ লাগাতেন। সেদিন বিশেষ পূজা হতো। তখন কোন রাসায়নিক রঙ পাওয়া যেত না, সমস্ত রঙ-ই নানা রকম ভেষজ প্রাকৃতিক জিনিষ থেকে তৈরী হতো; হাড়ির তলার ভুষো কালিতে বানানো হতো কালো রঙ, খয়ের থেকে খয়েরী, হলদে মাটি গুলে তা থেকে হতো দু তিনটি রঙ, বহু বুনো গাছপালা ফলপাকুড় সেদ্ধ করে তৈরী হতো বেগুনী, সবুজ, নীল আর লাল রঙ। চুন আর খড়িমাটিতে হতো সাদা, গোলাপী, হাল্কা জাতীয় সমস্ত রঙ। পাট রাঙ্গিয়ে বানানো হতো অসুরের চুল, সিংহের সোনালী কেশর আর সমস্ত দেবদেবীর চুল। তারপর সেই রঙ্গীন পাট ঝুলিয়ে দেওয়া হতো নাটমন্দিরের দড়িতে। দেবীর গয়না পোশাক সবই হতো মাটির তৈরী। কাজের ফাঁকে দুপুরে বা বিকেলে শরৎকামিনী রোজই একবার করে আসতেন প্রতিমা দেখতে। একবার তো শেষমূহুর্তে বেশ বিভ্রাট হলো; তখন মূর্তিগড়া প্রায় শেষ, হঠাৎ শোরগোল উঠল যে অসুরের মুখটা যেন নয়াবাড়ির জমিদারের মত দেখতে হয়েছে। হায় সর্বনাশ !! কি কাণ্ড ! নয়াবাড়ি আমাদের প্রতিবেশী জমিদারী, সেনবাড়ীর কর্তারা সবাই অসুর দেখতে এলেন এবং একবাক্যে বললেন যে নতুন করে অসুর গড়া ছাড়া কোন পথ নেই। অথচ কাঠামো ভেঙ্গে তা করা প্রায় অসম্ভব। নিবারণ মশাই চিন্তায় ভয়ে প্রায় শয্যাশায়ী। শেষবিকেলে শরৎকামিনী এলেন অসুর দেখতে। তারপর নাটমন্দিরে বসে নিবারণের দুরবস্থা শুনে নেপালী কাগজে* রঙ দিয়ে এঁকে দিলেন দাড়িমুখো এক অসুর মুখ। সেবার ঐ অসুরের মুখে দাড়ি লাগানোয় তাকে দেখতে আর নয়াবাড়ির জমিদার কর্তার মতো লাগলো না; সেই প্রথম সেনবাড়ীতে দাড়িওয়ালা অসুর দেখা গেলো, যদিও রঙ তার রইলো তেমনই সবুজ। অসুরের দেহবর্ণ সবসময়ই গাঢ় সবুজ বা নীল হতো। অসুরের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়াতে সবাই খুশী, শরৎকামিনীকে সবাই বাহবা দিতে থাকলো। তিনি শুধু হাসলেন আর বললেন, ‘এইবার নিবারণের হাতে যবন অসুর সেনবাড়ীতে আইলো’।

*নেপালী কাগজ তৈরী হতো নেপালে, গাছের কাঠ পাতার মণ্ড দিয়ে। খসখসে, অথচ ভারী হাল্কা। সোনালী বাদামী তার রঙ। নেপাল থেকে যারা সেনবাড়ীতে ব্যবসা করতে আসতো, এই কাগজ ছাড়াও তারা আনতো গরম পোশাক, শীতবস্ত্র, চীনা তসর, চমড়ি গরুর লোম দিয়ে বানানো চামড়, গরুর দুধের শুকনো খণ্ড যা কবিরাজী ওষুধে ব্যবহার হতো, কাঠের বাসন আর দামী কার্পেট।